পার্থিবজগতের অপার্থিববিষয়সমূহ বিশ্লেষণ

অনন্ত বিজয় দাশ
ananta@inbox.com

পার্থিবজগতের জল, বায়ু, আহার্যের স্বাদ নিয়ে আমরা মানুষ, পশু-উদ্ভিদ সকলেই পার্থিব জগতে বেঁচে আছি। জগতের রূপ-রস-গন্ধ আমাদের মনকে ভরিয়ে তুলে, আনন্দ জোগায়। আমাদের ভালো-মন্দ-সুস্থতা-অসুস্থতা সবকিছুই এই পার্থিবজগতকে কেন্দ্র করে। যেমন ধরুন, দেখা সাক্ষাতের সময় প্রায়ই একে অপরকে জিজ্ঞেস করি, কেমন আছেন? প্রত্যুত্তর আসে—ভালো আছি অথবা ভালো নেই। এই ভালো থাকা বা না-থাকা সবই ইহজাগতিক অবস্থাকে কেন্দ্র করে। আমরা সুখস্বপ্ন-কল্পনায় দেখি—জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, বিত্তশালী হওয়া, ব্যাপক পরিচিতি লাভ ইত্যাদি; এ সবই কিন্তু পার্থিবজগতে চাই। শোনা যায়, কেউবা স্বপ্নে স্বর্গ-নরক দেখেছেন। স্বর্গের অতিমনোমুগ্ধকর পানাহার, অবাধ স্বাধীনতা অথবা নরকের আগুনে দগ্ধ পাপী-তাপীর তীব্র কষ্টের রেশ কিন্তু এই ইহজগতে পেয়ে থাকি। আমরা কোথাও এমন কিছু কল্পনা করতে পারি না, যা ইহজগতে নেই; বোধ করি, কোনো না কোনোভাবে এই বস্তুজগতকে কেন্দ্র করে আমাদের যাবতীয় চিন্তার পরিধি। এরপরও অনেকে বলেন, অতিপ্রাকৃত শক্তি অথবা ঈশ্বর (গড, আল্লাহ, ইয়াহুয়া ইত্যাদি) কোনোভাবেই পার্থিবজগতের অধীন নয়। কিন্তু ঈশ্বরের যে সকল বৈশিষ্ট্য তাঁর অনুগতরা প্রকাশ করে থাকেন, যেমন—সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী, সর্বস্থানব্যাপী বিরাজমান ইত্যাদি, আসলে একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় ওগুলো—যেমন শক্তিমত্তা এই বস্তুজগতেরই অধীন, প্রায়শ দেখি শক্তিমানদের প্রতি বেশিরভাগ মানুষ ভীতি-শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম বজায় রেখে চলে, গর্বভরে ঘোষণা করে, 'বীরভোগ্য বসুন্ধরা'; জ্ঞান অন্বেষণের স্পৃহা সকল মানুষেরই আছে, কিন্তু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বে সে সর্বজ্ঞানী হতে পারে না, আর স্থান-কাল-পাত্র তো বস্তুজগতের অধীন। এভাবে ঈশ্বরের সংজ্ঞায় ঈশ্বরকে ভাঙলে বুঝা যায় অতিপ্রাকৃতের শিরোমনি ঈশ্বর সামান্য তৃণসমমানুষের চিন্তার একটু বর্ধিতরূপ মাত্র। এজন্যই হয়তো পার্থিবজগতের বেশকিছু জ্ঞানী-গুণী বিজ্ঞানী দার্শনিকেরা বলেন—অতিপ্রাকৃত-অপার্থিব-অলৌকিক বলতে কিছুই নেই; যা আছে, তা এই পার্থিবমানুষেরই কাল্পনিক সৃষ্টি। আরো বলেন—পার্থিবজগতে বিশ্বাসী কিংবা পার্থিবজগতে অবিশ্বাসী নির্বিশেষে পার্থিবজগতের সকল মানুষসহ—সকল প্রাণী, উদ্ভিদ, জড়, বিশ্ব-মহাবিশ্বের সবকিছুই পার্থিব প্রক্রিয়ায় উদ্ভুত। কিন্তু একমাত্র মনুষ্যপ্রজাতি বাদে অন্য কোনো প্রাণীর (উদ্ভিদসহ) ক্ষেত্রে প্রমাণ পাওয়া যায়নি, পার্থিবজগতের প্রতি তার অবিশ্বাস; অপার্থিবের প্রতি আকাঙ্ক্ষা-বাসনা-লালসা। হয়তো এ বক্তব্য দেখে কেউ কেউ বলবেন—"মানুষ ব্যতীত অন্য কোনো প্রাণীর জ্ঞান এত উন্নত নয় যে ওরা অপার্থিবের সন্ধান পাবে; আমরাই মানুষেরা অপার্থিবের কল্যাণে একমাত্র *আশারাফুল মাকলুকাত!* " কিন্তু আমাদের দীর্ঘকালের কঠোর অধ্যাবসায়ে লব্ধ বিজ্ঞান ভিন্ন কথা বলে, বলে—পৃথিবীর যাবতীয় অপার্থিবতা আমাদের মধ্যেই বিরাজমান, সবকিছু পার্থিব কারণেই সৃষ্ট। এও বলে, পার্থিবতা সম্পর্কে সকলের ধারণা স্পষ্ট না থাকা এবং পার্থিবতা সম্পর্কে এখনো সবকিছু না জানার কারণে—ভয়ে, লোভে, লালসায়, ভণ্ডামিতে, সস্তা প্রচারের মোহে আবিষ্ট হয়ে পার্থিবতা ভুলে অপার্থিবতার জয়গান গেয়ে বেড়াই, তথাকথিত অলৌকিকতার পায়ে মাথা নত করে আত্মসন্তুষ্টি লাভ করি, গুটিকয়েক শোষক-ভণ্ড-প্রতারক-প্রবঞ্চক-মানসিক রোগীদের (তথাকথিত) ঈশ্বরের প্রতিভূ বানিয়ে আমাদের একমাত্র পার্থিবজগৎ তাদের জন্য উৎসর্গ করে ফেলি। এতে মনুষ্যজীবনের ক্ষতি ভিন্ন লাভ মোটেই হয় না। যুগ যুগ ধরে রক্ত পানি করা শ্রমে উপার্জিত অর্থ অন্যায়-অসাম্য টিকিয়ে রেখে ভণ্ডের দলের লুটে নেয়া—চেয়ে-চেয়ে দেখা ছাড়া আমরা আর কিছুই করতে পারি না। আমাদের অপ্রাপ্তি-আর্তনাদ-ক্ষোভ-চোখেরপানি-হাহাকার—সবই অপার্থিবতার

দেয়ালের নীচে চাপা পড়ে আছে; জনগণের সাম্যবাদের স্বপ্ন সুদূর আকাশে পাড়ি জমিয়েছে, ধরণীতে জনগণতন্ত্র শেকলবদ্ধ হতে চলছে অপার্থিবতার কারাগারে—এ বাস্তবতায় এই প্রবন্ধে দীর্ঘসময় ধরে বহুল প্রচারিত বেশকিছু জনগুরুত্বপূর্ণ (!) তথাকথিত অপার্থিববিষয়সমূহকে নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করা হবে, সভ্যতা-ভব্যতার নামে এঁটে থাকা মুখোশ উন্মোচন করে কতিপয় অতিলৌকিকতার প্রতিভূদের কুৎসিৎ নগ্নরূপ উপস্থাপন করা হবে। আশা করি পাঠক, সত্য উদ্ধরণের এই সৎপ্রচেষ্টায় আপনারা সঙ্গে থাকবেন এবং এ সম্পর্কিত যেকোনো ভিন্নমত-মতবিরোধ-তথ্যের ঘাটতি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্দ্বিধায় জানাবেন।

(১) **ঈশ্বর দর্শন ও অলৌকিক অনুভূতি** :— পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বহু ধর্মীয় মহীয়সী মহাপুরুষ-নবী-সাধক-ঠাকুর-পীরবাবা-মৌলভির খবর পাওয়া যায়, যারা নিজ-নিজ ধর্মের ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। যেমন ইহুদিদের নবি হযরত মুসা সিনাইপর্বতে গিয়ে ঈশ্বরের সাথে দেখা করেছেন; ইসলাম ধর্মে হযরত মোহাম্মদ দীর্ঘ বিশ বছরের অধিক জিব্রাইল নামক অপ্রাকৃত সত্তার সাথে যোগাযোগ রেখে আল্লাহর কাছ থেকে কোরানের বাণী ধারণ করেছেন এবং একসময় বুরাক নামক আধা ঘোড়া-আধা পাখি পশুর পিঠে চড়ে বেহেশত-দোজখ প্রদক্ষিণ করে এসেছেন এমন কী স্বয়ং আল্লাহর সাথে কথোপকথন করেছেন; আর খ্রিস্ট ধর্মে হযরত যিশু স্বয়ং নিজেকে ঈশ্বরের পুত্ররূপে দাবি করেছেন। হিন্দুধর্মে তো এরকম অবতারবাদ বা দেবতাদর্শন কাহিনীর অভাব নেই, ঘরে ঘরে প্রায়ই এরকম কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়; কেউবা ঈশ্বরকে স্বপ্নে দেখেছেন, কেউ সামনা-সামনি দেখেছেন, কেউ ঈশ্বরের শব্দ শুনেছেন, কেউ ঈশ্বরের সাথে কথা বলেছেন, আলোচনা করেছেন, ধর্মপ্রচারের জন্য পরিকল্পনা করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের কালীমায়ের সাথে সাক্ষাৎ, লোকনাথের শিবের অবতার ইত্যাদি। প্রতিটি ধর্মেই এরকম কম বেশি মহাপুরুষের কাহিনী আছে, যারা স্বয়ং ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পেয়েছেন অথবা দূত মারফত সময়-সময় বাণী পেয়েছেন। আবার এও শোনা যায়, কেউ কেউ নিজেকে ঈশ্বরের অবতার হিসেবে দাবি করেছেন, কারোবা শরীরে ঈশ্বর এসে ভর করেছেন (হিন্দুধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মে এরকম মজার-মজার 'অবতার' আবির্ভাবের গল্প বলতে গেলে শোনা যায় না)। সারা পৃথিবীতে এরকম অসংখ্য অতিপ্রাকৃত শক্তির সাক্ষাৎপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কৌশলি-আবেগময় সরল(?)বক্তব্য আমরা আমজনতা নিঃসঙ্কোচে বিশ্বাস করেছি যুগ যুগ ধরে, নিজেদের উজাড় করে দিয়ে মহাপুরুষের পদসেবা করেছি, প্রার্থনা করেছি রাতদিন এক করে[১], নিজেরা অন্ন গ্রহণ না করে পুণ্য লাভের আশায় গুরুর পাতে তুলে দিয়েছি, গুরুর আশির্বাদ লাভের আশায় ইহকাল-পরকাল সব এক করে দিয়েছি তবুও আমাদের, গুরুর সেবা করার তৃপ্তি মেটেনি। এ জনতার কাতারে মন্ত্রী থেকে ফকির, শিক্ষিত থেকে অশিক্ষিত, আমলা থেকে কামলা সক্কলেই আছেন। কিন্তু আফসোসের বিষয়, আমাদের কাছে অত্যন্ত সম্মানিত অতিপ্রাকৃতশক্তি ঈশ্বর দর্শন, ঈশ্বরের সাথে কথোপকথন, ঈশ্বরের অবতার, অলৌকিক নানা অনুভূতি ইত্যাদির দাবিদারেরা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নিছকই একজন মানসিকরোগী। আর নয়তো ভণ্ড-প্রতারক মাত্র[২]। বিজ্ঞান, বিশেষ করে মনোবিজ্ঞানের ভাষায়, এ ধরনের মানসিকরোগীদের ঠিকমতো চিকিৎসা হলে মানসিক ভ্রান্তি দূর হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে; ফিরে আসতে পারেন সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, সুইজারল্যান্ডের মনোবিজ্ঞানী ডঃ ওয়াল্টার হেজ, আমেরিকার মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানী ডঃ জেমস্ ওল্ডস্, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের জে. ডেলগাজোসহ বিশ্বের আরো বহু মনোবিজ্ঞানী মানুষের মনে (চিন্তায়) ঈশ্বরদর্শন ও ঈশ্বরেরবাণী শোনার অনুভূতি সৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছেন, শুধু তাই না, তাঁরা দেখিয়েছেন বাহির থেকে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্নায়ুকোষে উত্তেজনা ও নিস্তেজ অবস্থার সৃষ্টি করে আধ্যাত্মিক অনুভূতিসহ প্রেম, ঘৃণা, ভয়, সাহসের অনুভূতি তৈরি করা সম্ভব। তবে যদি কেউ ইচ্ছাকৃত অভিনয়ের মাধ্যমে অপার্থিব অনুভূতি নিয়ে প্রতারণা করে থাকেন, তাহলে বিজ্ঞান কেন,

কারো বাপেরও সাধ্য নেই—এদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। শুধু নিশ্চিত করতে পারে কারাদণ্ড।

মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি, বিজ্ঞানসম্মতভাবে ঈশ্বর দর্শন-অলৌকিক অনুভূতি সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমে আমাদের জানতে হবে—মনোবিজ্ঞান (Psychology) এবং মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের বিচিত্র কর্মকাণ্ড সম্পর্কে।[৩] মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের একটি বিশেষ ধর্ম হলো গতিময়তা। সবার মস্তিষ্কের গতিময়তা সমান নয়, অর্থাৎ উত্তেজনা-নিস্তেজনায় দ্রুত সাবলীলভাবে মানিয়ে কাজ করার ক্ষমতা সমান নয়। কেন নয়? কারণ—এই মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরিবেশের ওপর নির্ভর করে। সামাজিকীকরণের সময় যারা বিদ্যা-শিক্ষা-জ্ঞান সুস্থভাবে লাভ করেছে অর্থাৎ মূলত যারা চর্চা করার বেশি সুযোগ পেয়েছে—তাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের গতিময়তা বেশি, তারা যেকোন বিষয়ে চট্‌পট্ বুঝতে পারে, মানিয়ে নিতে পারে সহজেই। আর যাদের সামাজিকীকরণ ভাল হয়নি, পরিবেশের কারণে বিদ্যা-শিক্ষা-জ্ঞান আহরণ-চর্চা করার সুযোগ কম পেয়েছে তাদের স্নায়ুকোষের গতিময়তা কম বা দুর্বল হয়ে থাকে, তাদের যাচাই-বাছাই করার মানসিকতাও থাকে কম, তারা সহজেই আক্রান্ত হয় কুসংস্কারে, অপবিশ্বাসে কিংবা বিভিন্ন মানসিক রোগে। এ সমাজে বহুল প্রচলিত তথাকথিত বিভিন্ন অতিপ্রাকৃত/অলৌকিক ভ্রান্ত অনুভূতিকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় ইলিউশন (Illusion), হ্যালুশিনেইশন (Hallucination), ডিলিউশন (Delusion), প্যারানোইয়া (Paranoia) বলে থাকে; এবং ব্যক্তির ওপর জিন-ভূত-দৈত্য-দানো-পরী-রাক্ষস-খোক্ষস থেকে শুরু করে খোদ খোদা-আল্লাহ্-ভগবান-ঈশ্বর-ইয়াহুয়া ইত্যাদি সকল অতিপ্রাকৃত শক্তির অবতার কিংবা ভর মনোবিজ্ঞানের ভাষায় হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের মানসিকঅসুখ। যেমন হিস্টিরিয়া (Hysteria), এপিলেপ্‌সি (Epilepsy), ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ (Maniac Depresive), স্কিটসোফ্রেনিয়া (Schizophrenia) ইত্যাদি।[৪] মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, অপার্থিব/অপ্রাকৃতঅনুভূতির কিংবা মানসিকরোগগুলোর পৃথক পৃথক উপসর্গ থাকলেও একজন ব্যক্তির মধ্যে পৃথক পৃথক উপসর্গগুলো একসাথে বিরাজ করতে পারে; এবং প্রায়ই একসাথে বিরাজ করেও।

এখন এ সকল ভ্রান্তঅনুভূতি এবং মানসিকরোগ নিয়ে ক্রমান্বয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক—বাস্তব জীবনে আমরা সবাই ইলিউশন বুঝলে বা না-বুঝলেও এর সাথে পরিচিত আছি। মনোবিজ্ঞান বলে, ইলিউশন বা ভ্রান্ত অনুভূতি হচ্ছে—"কোনো বস্তু প্রকৃতপক্ষে যা, তাকে সেইভাবে উপলব্ধি না করা।" যেমন—একটি গ্লাসে পানি নিয়ে সোজা চামচ ডুবিয়ে রাখলে, চামচটিকে আর সোজা দেখা যায় না, কিছুটা বাঁকা দেখায়। কারণ, এখানে পানি ও বাতাসের প্রতিসরাঙ্ক আলাদা হবার জন্য আমাদের দর্শনানুভূতি ভুল করেছে। গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড রোদেলা দুপুরে পিচ ঢালা রাস্তাকে ভেজা ভেজা মনে হয়, মরুভূমিতে মরীচিকা কিংবা রাতের অন্ধকারে দড়িকে সাপ ভাবার কথা সবাই জানি; এগুলো ভ্রান্ত দর্শনানুভূতির উদাহরণ। আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়কে কেন্দ্র করে এ ধরনের ভ্রান্তিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যথা:— (১) দর্শনানুভূতির ভ্রম (Optical/Visual illusion), (২) শ্রবণানুভূতির ভ্রম (Auditory illusion), (৩) স্পর্শানুভূতির ভ্রম (Tactile illusion), (৪) ঘ্রাণানুভূতির ভ্রম (Olfactory illusion), (৫) স্বাদগ্রহণের বা জিহ্বানুভূতির ভ্রম (Taste illusion)। মনোবিজ্ঞানীরা সংক্ষেপে বলেন—ইলিউশন হলো প্রত্যক্ষণের ভুল। ইন্দ্রিয়গ্রাহী উদ্দীপকের প্রভাবে প্রত্যক্ষণ বা উপলব্ধি হয় বলে আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের যেকোনো একটির জন্যই ইলিউশন হতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে, এই ভুলের জন্য **আমাদের ইন্দ্রিয় কিন্তু দায়ী নয়, স্নায়ুসংকেত বিশ্লেষণে মস্তিষ্কের অক্ষমতাই এই ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।** শুধু মানসিক বা শারীরিক অসুস্থতদেরই ইলিউশন হয় না, সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষদেরও ইলিউশন হয়ে থাকে (পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিভ্রম ঘটলেও সচরাচর বেশি ঘটে থাকে দৃষ্টি ও শ্রবণজনিত ইলিউশন)। শ্রবণজনিত ইলিউশন হলো একটা শুনতে গিয়ে অন্য কিছু শোনা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘোরের

মধ্যে থাকলে এরকম ঘটে থাকে। যেমন কারো আসার অপেক্ষাতে খুব উত্তেজিত হয়ে থাকলে হঠাৎ টেলিফোন কিংবা অন্য কিছুর শব্দকে মনে হয় কলিংবেলের শব্দ। আবার শরীরে হঠাৎ করে সুতোর স্পর্শ লাগলে অনেকে বিছে ভেবে লাফ দিয়ে ওঠেন, স্পর্শানুভূতি ভ্রমের উদাহরণ। ভেজা সুপারি থেকে অনেক সময় খুব নোংরা গন্ধ আসে, এটাকে অনেকে নর্দমার ময়লা-আবর্জনার গন্ধ বলে ভুল করেন; যা ঘ্রাণানুভূতির ভ্রম। মিষ্টি খাওয়ার পর চা খেলে খুব তিক্ত স্বাদ লাগে, এটি স্বাদ গ্রহণের ভ্রম।—পাঠক এখানে ইলিউশন সম্পর্কিত খুব সাধারণ কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হল, আপনার চারপাশেই আরো হাজার-হাজার উদাহরণ পাবেন; শুধু একটু নজর দিলেই চলবে। বলা যায় ইলিউশন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণেই—গ্রামে-গঞ্জে-শহরে জিন-ভূত-প্রেত দেখার ভয়ঙ্কর সব কাহিনী এখনো প্রচুর শুনতে পাওয়া যায়; জন্মের পর থেকে শৈশব, শৈশব পেরিয়ে কৈশোর পর্যন্ত তথাকথিত অতিপ্রাকৃত শক্তি সম্পর্কে শুনতে শুনতে নিজের অজান্তে এদের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মে যায়, চিন্তার কুঠরিতে ভক্তি-ভয়ের সৃষ্টি হয়। ফলে হঠাৎ করে ইলিউশন হলে ঈশ্বরের দেখা পেয়েছেন, ভূতের দেখা পেয়েছেন বলে ভয় পান অথবা অন্য কোন অলৌকিক সত্তার বাস্তব অস্তিত্ব আছে বলে মনে করেন। এদিকে হ্যালুশিনেইশন বা অলীক প্রত্যক্ষণ—কোন কিছুর বাস্তব অস্তিত্ব নেই, কিন্তু তাকে দেখতে পাওয়া/শুনতে পাওয়া/স্পর্শ পাওয়া/স্বাদ পাওয়া/ঘ্রাণ পাওয়ার অনুভূতিকে বলে থাকে। মনোবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্ন দেখা আর জাগ্রত অবস্থায় অলীকপ্রত্যক্ষণ একই ধরনের শারীরবৃত্তিক ব্যাপার। আমরা যখন কোন কিছু প্রত্যক্ষণ করি, তখন ওই বস্তুর একটি ছাপ আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে রয়ে যায়। ফলে প্রয়োজন মত কল্পনার মধ্যে বস্তুটির প্রতিবিম্ব অবলোকন করতে পারি ঐ বস্তুর বাস্তব উপস্থিতি ছাড়াই; কিন্তু কল্পনার প্রতিবিম্বটি প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মত উজ্জ্বল হয় না। উপলব্ধিজনিত উত্তেজিত স্নায়ুকোষগুলোই আমাদের মস্তিষ্কে ধারণা ও কল্পনার উৎস। কোনো কারণে আমাদের চিন্তায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের স্বাভাবিক ধর্ম উত্তেজনা (excitation) ও নিস্তেজনা (inhibition)-তে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। অতিরিক্ত টেনশন বা দুশ্চিন্তার ফলে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের উত্তেজনা বিন্দুগুলো ধীরে-ধীরে নিস্তেজিত হবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে; তখন উত্তেজিত কোষগুলো অনড়ত্ব লাভ করে; এর দরুণ মস্তিষ্কে বাস্তবের বিকৃত ও অতিরঞ্জিত প্রতিফলন ঘটে। একে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় হ্যালুশিনেইশন বলে আর আমরা সাধারণেরা ঈশ্বর দেখেছি, ভূত দেখেছি বলে বিভ্রান্ত হই। পঞ্চেন্দ্রিয়ের ওপর ভিত্তি করে হ্যালুশিনেইশনকেও পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে—(১) দর্শনানুভূতির অলীকভ্রম (Optical/Visual Hallucination), (২) শ্রবণানুভূতির অলীকভ্রম (Auditory Hallucination), (৩) স্পর্শানুভূতির অলীকভ্রম (Tactile Hallucination), (৪) ঘ্রাণানুভূতির অলীকভ্রম (Olfactory Hallucination), (৫) স্বাদগ্রহণের বা জিহ্বানুভূতির অলীকভ্রম (Taste Hallucination)। সুস্থ মানুষেরও হ্যালুশিনেইশনের অভিজ্ঞতা হতে পারে। কিন্তু যদি এই অভিজ্ঞতা কারোর বারে বারে ঘটে থাকে, তবে তা মানসিক বিকারের লক্ষণ বলে সন্দেহ করতে হবে। এছাড়া মাদকদ্রব্য (আফিম, গাঁজা, চরস, অ্যামিটাল সোডিয়াম, ম্যান্ড্রেক্স, ধুতরা ইত্যাদি) সেবনের মাধ্যমেও অলীকবিভ্রম বা Hallucination ঘটতে পারে। এসকল মাদকদ্রব্যের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে লাইসারজিক্ অ্যাসিড ডাইএথিল্যামাইড (সংক্ষেপে LSD)। এগুলোকে হ্যালুশিনোজেন্স (Hallucinogens) বা মানসিকবিভ্রমকারী ড্রাগ বলে। এসব ড্রাগে টেট্রাহাইড্রোক্যানাবিল (THC) নামে রাসায়নিক পদার্থ থাকে, এছাড়াও ক্যানাবিনল, ক্যানাবিডিয়ল (একত্রে ক্যানাবিনয়েডস বলে) থাকে। যখন এসব মাদকদ্রব্য শ্বাসের সঙ্গে অথবা ফুসফুস থেকে রক্তে শোষিত হয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছায়, তখনই শুরু হয় এগুলোর কাজ। প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের ভারতবর্ষে সাধু-সন্নাসীরা সোমরস-গাঁজা-ভাং-চরস ইত্যাদি উত্তেজক মাদক গ্রহণ করে ঈশ্বর দর্শন, ঈশ্বরের কথামৃত শোনা, তুরীয় আনন্দ ইত্যাদি অতীন্দ্রিয় অনুভূতি লাভ করে আসছেন। প্রাচীন ঋকবেদে সোমরসের অনেক গুণগান করা হয়েছে এবং সেই বৈদিকযুগে যাগযজ্ঞের সময় মুনি-ঋষিরা সোমরস পান করতেন। তন্ত্রসাধনায় অত্যাবশ্যক পাঁচটি 'ম'—এর একটি হল মদ। যোগশাস্ত্রের প্রবক্তা পতঞ্জলি বলেছেন,

"জন্মৌষধিমন্ত্রতপস্যামাধিয়ঃ সিদ্ধয়ঃ" (যোগসূত্র ১৪।১)—অর্থাৎ জন্মসূত্রে, বনৌষধির সাহায্যে, জাদুমন্ত্রোচ্চারণে, কঠোর সংযম পালনে বা মনঃসংযোগের দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয়, অর্থাৎ অতিপ্রকৃত শক্তি অর্জিত হয়। শুধু মাদকদ্রব্য গ্রহণ নয়, ডেলিরিয়াম (Delirium) বা বিকারগ্রস্থ অবস্থায় যেমন প্রবল জ্বর, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, রক্তদূষণ, রিউম্যাটিক ফিভার, থাইরয়েড গ্রন্থির অত্যাধিক ক্ষরণ, অস্ত্রোপচারের পরে, মাথায় আঘাত লাগলে, মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে বিশেষত টেমপোরাল লোব ও মধ্য-মস্তিষ্কে টিউমার, রক্তক্ষরণ ইত্যাদি কারণে অলীকদর্শন (আত্মা-ঈশ্বর-ভূত-প্রেত) হতে পারে। এছাড়া অপারেশনের আগে অ্যানাস্থিসিয়া প্রয়োগ করলে অনেকে মৃত্যুর আশঙ্কায় চরম ভীত হয়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করতে থাকেন, ফলে কেউকেউ চেতনা লোপ পাওয়ার আগে বা অর্ধচেতন অবস্থায় ঈশ্বর দর্শন, ঈশ্বরের বাণী শোনেন। মেডিকেলের বিভিন্ন কেস হিস্ট্রি থেকে জানা যায় যাদের ভিটামিন বি-ওয়ান বা থায়ামিনের ঘাটতি থেকে বেরিবেরি রোগ হয় বা নিকোটিনিক অ্যাসিডের অভাবজনিত কারণে যে পেলেগ্রা রোগ হয় কিংবা যাদের প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত প্যারাথাইরক্সিন-এর মত কয়েকটি হরমোনের অভাব দেখা দেয়, তাদের মাঝে-মাঝে নানা অস্বাভাবিক প্রত্যক্ষের বিভ্রম বা হ্যালুশিনেইশন হয়ে থাকে।

ডিলিউশন হলো বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণা; ইলিউশন ও হ্যালুশিনেইশনের সাথে ডিলিউশনের চরিত্রগত পার্থক্য আছে, কিন্তু কেউ কেউ এদের তিনটিকে একত্রে ব্যবহার করে থাকেন। **কোনো একজনকে দেখে ঈশ্বর মনে হওয়াকে ইলিউশন, কিছুই নেই অথচ সামনে ঈশ্বরকে দেখতে পাওয়ার অনুভূতি হ্যালুশিনেইশন আর ঈশ্বর আছেন, তাকে অবশ্যই দেখতে পাওয়া যায়—এই অন্ধবিশ্বাস হলো ডিলিউশন।** ডিলিউশনের রোগী বিচার-বুদ্ধির ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তাদের ভ্রান্তবিশ্বাসে কোনো রকম যুক্তি-মুক্তচিন্তার ধার ধারে না। ডিলিউশন হওয়ার কারণ সম্পর্কে এখন পর্যন্ত যতটুকু জানা যায়—'মস্তিষ্কের গতিময়তা কমে এলে উত্তেজিত স্নায়ুকোষগুলো অনড় অবস্থায় পৌঁছায়। উত্তেজনা ওই বিশেষ বিন্দুগুলোতে যেন অবস্থান-ধর্মঘট (Strike) পালন করতে শুরু করে। ফলে অনড় উত্তেজিতকোষগুলির আশেপাশের কোষগুলি মাত্রাধিক নিস্তেজিত হয়ে যায়। এই নিস্তেজনা যদি মস্তিষ্কের অনেকটা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে তখনই ভ্রান্তধারণা পাকাপাকি মস্তিষ্কে গেঁথে যেতে পারে। কারণ উত্তেজিত বিন্দুগুলোর উত্তেজনা প্রায় স্থায়িত্বের আকার নেয়; মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশ সুস্থ থাকায় যুক্তিবুদ্ধি সাধারণভাবে মস্তিষ্কে কাজ করে কিন্তু উত্তেজিত অংশে প্রভাব ফেলতে পারে না। ভ্রান্তধারণার সঙ্গে স্থায়ী শর্তাধীন পরাবর্ত[৫] গড়ে ওঠার ফলে রোগীর নিজের ধারণা সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।' এ ধরনের রোগীর মধ্যে অনেকটা 'বিশ্বাসে মেলায় বস্তু...'-ই সার কথা। ডিলিউশন কয়েক রকমের রয়েছে, যেমন:— (১) ডিলিউশন অব রেফারেন্স বা আত্মপ্রাসঙ্গিক ভ্রান্তি (২) ডিলিউশন অব পারসিকিউশন বা নির্যাতনমূলক ভ্রান্তি (৩) ডিলিউশন অব ইনফ্লুয়েন্স বা প্রভাবিতকরণ ভ্রান্তি (৪) ডিলিউশন অব গ্র্যান্ডিয়ার বা বিরাটত্বের ভ্রান্তি। ডিলিউশন অব রেফান্সের রোগী মনে করেন, আশেপাশের সব কিছুই তাকে কেন্দ্র করে ঘটছে। চেনা অচেনা সবাই তার দিকেই নজর রাখছে, তাকে নিয়ে আলোচনা করছে, তার কথা ভেবেই চোখ চাওয়া-চাওয়ি করছে, তাকে নিয়ে উপহাস করার জন্য হাসাহাসি করছে—এমন সব তুচ্ছ ও সাধারণ ঘটনাকে অতিরঞ্জিত ও বিকৃত করে তার নিজের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে ভাবেন। ডিলিউশন অব পারসিকিউশনের রোগীর ভ্রান্ত বিশ্বাস যে, সবাই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, তাকে ভয় দেখাতে চাচ্ছে, তার ক্ষতি করার পরিকল্পনা করছে। মস্তিষ্কের নিস্তেজিত স্নায়ুকোষগুলো এই সময় অতিস্ববিরোধী পর্ব বা Ultraparadoxical phase-এ আসে। এই অবস্থায় ইতিবাচক উদ্দীপনায় নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলোর বিকারগত অনড়ত্ব, তারপর অতিস্ববিরোধী এই দুটো ব্যাপার একসঙ্গে বা একটার পর একটা ঘটলে এই ডিলিউশনের উদ্ভব হয়। ডিলিউশন অব ইনফ্লুয়েন্স-এর রোগীরা মনে করেন, তাদের চিন্তা-অনুভূতি-কাজকর্ম বাইরের কোনো অদৃশ্য শক্তি/অলৌকিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হচ্ছে। তার নিজের ইচ্ছায় কোনো কিছু করছেন না। তারা মনে করেন, তারা অতিপ্রকৃত শক্তির প্রতিনিধি অথবা অবতার।

ফলে তারা যা কিছুই করছেন, সবই ঈশ্বর বা অতিপ্রাকৃত শক্তির ইচ্ছাতেই করছেন। ডিলিউশন অব গ্র্যান্ডিয়ারের রোগীদের বিরাটত্বের ভ্রান্তির লক্ষণ দেখা যায়। এই রোগীরা নিজেদের বিষয়ে উচ্চ ধারণা ও বিশ্বাস পোষণ করে থাকেন; এরা মনে করেন স্বয়ং ঈশ্বর বা ঐ জাতীয় অতিপ্রাকৃত শক্তির সাথে তাদের যোগাযোগ হয়েছে, এবং অতিপ্রাকৃত শক্তি তাদের কথা শুনতে পাচ্ছে, তাদেরকে সমর্থন দিচ্ছে। বেশিরভাগ মহাপুরুষ বা অবতার নামধারীরা (রামকৃষ্ণ, লোকনাথ, যীশু, হযরত মোহাম্মদ, চৈতন্যদেব প্রমুখ) এই ডিলিউশনের শিকার। বিশেষ করে এখানে হিন্দুধর্মের মহাপুরুষ লোকনাথের নাম উল্লেখ করতে হয়; ভক্তদের কাছে তিনি ছিলেন শিবের অবতার, জীবিতকালে তাঁর শিষ্যদের প্রচণ্ড আত্মপ্রসিদ্ধি (কিংবা অহমিকা) নিয়ে বলতেন—"জলে-স্থলে-রণে-বনে-জঙ্গলে, যেখানেই বিপদে পড়িবে—আমাকে স্মরণ করিবে, আমিই তোমাদের রক্ষা করিব।" (বর্তমানকালের যেসকল ডাক্তার প্রাইভেট প্রেকটিস করেন, তাদের জন্য সুখবর, বাবা লোকলাথ আজ আর বেঁচে নেই, নয়তো—তিনি বেঁচে থাকলে প্রাইভেট ক্লিনিক, হাসপাতাল ইত্যাদি কতকিছুর ব্যবসা যে লাটে উটতো!) আবার মহাপুরুষদের মধ্যে কখনোবা ডিলিউশন অফ ইনফ্লুয়েন্স-এর উপসর্গ দেখা দিত। এ কথা বলার কারণ হচ্ছে, তাঁদের ধর্মপ্রচারের ইতিহাস দেখলে দেখা যায়, ধর্মপ্রচারের সময় প্রায়শ সোচ্চারে ঘোষণা দিতেন—"যা কিছুই করছেন স্বয়ং ঈশ্বরের নির্দেশেই করতেছেন।"[৬] বেশিরভাগ মহাপুরুষরাই গভীর প্রত্যয় নিয়ে বিশ্বাস করতেন—ধ্যান, উপাসনার মধ্য দিয়ে সমাধিস্থ অবস্থায় ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্ভব। ঈশ্বরদর্শনের তীব্র আকুতিতে তাঁরা কঠোর ইন্দ্রিয় সংযম ও কৃচ্ছ্রসাধন করতেন। এই কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, আর এ থেকেই ওনাদের 'ঈশ্বর' নামক হ্যালুশিনেইশন ঘটত[৭]। আবার কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে লোক-ঠকানোর জন্য, জনগণের কাছে নিজের ইমেজ বৃদ্ধির জন্য 'ঈশ্বর' 'ঈশ্বর' খেলা চালিয়ে থাকেন, তবে আর বলার কিছু নেই। জানেনই তো ভণ্ডলোকের বেওসা করার জায়গা বা ফায়দা লোটার কায়দার অভাব নেই!

প্যারানোইয়া (Paranoia) হলো 'বদ্ধমূল ভ্রান্তিজনিত মস্তিষ্কবিকৃতি'। এই ধরনের রোগীর ভ্রান্ত ধারণা স্থায়ী ও অটল হয়। এটি ব্যক্তিত্বের রোগ। যদিও এর সাথে ডিলিউশনের বেশ মিল লক্ষ্য করা যায়। তবে তফাৎ হচ্ছে প্যারানোইয়া রোগীর মধ্যে ভ্রান্ত ধারণাটাই প্রধান, অন্য কোনো লক্ষণ বিশেষ কিছু থাকে না। ওনারা অন্ধ-ভ্রান্ত বিশ্বাসের বাইরে দৈনন্দিন জীবনে একদম স্বাভাবিক আচার-আচরণসহ যুক্তি-বুদ্ধি অনুসরণ করেন। তবে কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মসচেতন থাকেন। প্যারানোইয়া রোগীদের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এঁরা নিজেদের ভ্রান্তবিশ্বাসের পেছনে খুব সুন্দর করে যুক্তি খাড়া করতে চেষ্টা করেন, অলীক ধারণাকে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। যার ফলে আপাত দৃষ্টিতে এঁদের মানসিক রোগী বলেই মনে হয় না। যেমনটা করে থাকেন ডিলিউশন অফ ইনফ্লুয়েন্সের রোগীরা।

এখন ওই মানসিকঅসুখগুলো নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা যাক। হিস্টিরিয়া বা মূর্ছারোগ হচ্ছে একরকম নিউরোসিস্। এই রোগের কারণ হিসেবে ধরা হয়—অবদমিত মনের অবচেতন কামনা-বাসনা পরিতৃপ্তির চেষ্টা। সাধারণভাবে দেখা যায়—কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, অল্পশিক্ষিত, শিক্ষার সুযোগ লাভে বঞ্চিত, বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা বা যুক্তির সাথে পরিচিত হবার সুযোগ না পাওয়া ব্যক্তিদের মস্তিষ্কে চিন্তার সহনশীলতা কম থাকে। এই শ্রেণির লোকেরা এক নাগাড়ে একই কথা শুনলে-ভাবলে-বললে, ওদের মস্তিষ্কের বিশেষ কিছু কোষ বার বার উত্তেজিত হতে শুরু করে, আলোড়িত হতে থাকে। একসময় উত্তেজিত কোষগুলো অকেজো হয়ে অন্য কোষগুলোর কাছে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে মস্তিষ্কের কাজকর্মে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এসময় এরা আবেগে চেতনা হারিয়ে ফেলে বা অদ্ভুত আচরণ করতে শুরু করে। এই রোগের বিশেষ কিছু লক্ষণ হচ্ছে—এক রঙকে অন্য রঙ বলে মনে হওয়া, এক বস্তুর জায়গায় দুটি দেখা (Double Vision), সম্পূর্ণ স্পর্শহীনতা বা আংশিক স্পর্শহীনতা দেখা দেয়া, বস্তুর স্থান নির্ণয়ে ভুল করা,

হাতের আঙুল বা জিবের মৃদু কম্পন, বাকশক্তি রোধ হয়ে যাওয়া, সর্বশরীরে খিচুনি বা মৃদু সঞ্চালন, ফিট বা মূর্ছা যাওয়া। এই ধরনের একাধিক লক্ষণ হিস্টিরিয়া রোগীর মধ্যে মূর্ছা যাবার সময় দেখা দিতে পারে। আমরা যাদের প্রচলিত ভাষায় 'ঈশ্বরে ভর', 'জিন-ভূতে ভর' করেছে বলে ধারণা করি, তাদের সিংহভাগই মনোবিজ্ঞানের ভাষায়, হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত রোগী। এপিলেপ্সির রোগীরা এমনিতে ভালো থাকে তবে কিছুদিন পরপর তাদের মধ্যে এই রোগের আবির্ভাব ঘটে থাকে, তবে খুব কম সময়ের জন্যে রোগ-অবস্থা হয়ে থাকে, তারপরেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। এই রোগ-অবস্থাকেই এপিলেপ্সির ফিট (Epileptic fit) বা খিঁচুনি বা তড়কাও বলা হয়। ফিট শুরু হবার সঙ্গেই রোগী অজ্ঞান হয়ে যায় এবং সারা দেহের (চোখ, মুখ, বুক, পিঠ, পেট, হাত, পা) মাংশপেশীর প্রবল প্রক্ষেপ বা খিঁচুনি আরম্ভ হয়। ফিটের সময় দাঁতে দাঁত লেগে যেতে পারে এবং জিভে কামড় পড়তে পারে, মুখ দিয়ে ফেনা বের হয়, কোনো কোনো সময় অসাড়ে প্রস্রাব হয়ে যায়। উল্লেখ করা যায় এপিলেপ্সির সাথে হিস্টিরিয়া রোগের কিছুটা পার্থক্য আছে, যেমন—এপিলেপ্সির ফিট সাধারণত ১ থেকে ২ মিনিট হয়, ফিটের সময় প্রথমে হাত-পা শক্ত হয়ে যায় এবং সারা শরীরে ঝাঁকুনি হতে থাকে, সবশেষে শরীর শিথিল হয়ে যায়, এই ফিটের সময় পুরোপুরি অজ্ঞান হয়ে যায়, প্রায় সময় ফিটের ঘটনাগুলি পর-পর ঘটে থাকে, ঘুমের মধ্যে অথবা জেগে থাকা অবস্থায় ফিট হতে পারে, এই রোগ স্ত্রী-পুরুষ অথবা যে কোনো বয়সের হতে পারে এবং মস্তিষ্কের শরীরভিত্তিক গোলযোগের ফলেই এই ফিট হয়। আর হিস্টিরিয়ার ফিট দীর্ঘস্থায়ী হয়, কোন নির্দিষ্ট সময়ে ফিট হয় না, প্রায় সময়ে এলোমেলো ভাবে হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করে, তবে পুরো অজ্ঞান থাকে না, রোগী অনেক সময় পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝতে পারে। ঘুমের মধ্যে বা একা থাকলে ফিট হয় না, লোকজনের সামনেই ফিট হয়। কিশোরী এবং যুবতীদের মধ্যে এ রোগ বেশি দেখা যায় এবং এই রোগে মস্তিষ্কে শরীরভিত্তিক গোলযোগ দেখা যায় না। ম্যানিয়াক ডিপ্রেসিভ (Maniac Depresive) হচ্ছে—মানসিক অবসাদ জনিত অসুখ। এ রোগের বেশিরভাগ রোগীই কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, শিক্ষা, সহনশীলতা, যুক্তি, মুক্তবুদ্ধির সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ না পাওয়া মানুষ। এরা পারিবারিক জীবনে অসুখী, দায়িত্বভারে জর্জরিত এবং এর দরুন মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্থ। অসুখের সময় এদের স্বাভাবিক চিন্তা-চেতনার ক্ষমতা কমে যায়, হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, বিভিন্ন ধরনের অঙ্গভঙ্গি (জোরে জোরে মাথা দোলানো, উচ্চস্বরে আবোল-তাবোল বলা, হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করা ইত্যাদি) করে। এ ধরনের অসুখ দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে। মাঝে মাঝে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেও পুনরায় আবার অসুখ ফিরে আসতে পারে।

আর স্কিটসোফ্রেনিয়া (কেউ কেউ একে সিজোফ্রেনিয়া বলে থাকেন) হচ্ছে প্রধানত চিন্তার রোগ (Disorder of thinking)। কোনো কোনো মনোবিজ্ঞানী লক্ষণগত কিছু মিল আছে এমন কয়েক ধরনের গুরুতর কঠিন মানসিক ব্যাধিকে একত্রে স্কিটসোফ্রেনিয়া বলে থাকেন। এখানে আগ্রহুদ্দীপক যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই রোগের শিকার হন আত্মস্থ ধরনের মস্তিষ্কের অধিকারীরা (যারা চিন্তা করতে ভালবাসেন)। তারা কোনো কিছু গভীরভাবে চিন্তা করতে গিয়ে সঠিকভাবে চিন্তার মূলে পৌঁছাতে না পারলে বা বুঝতে গিয়ে ঠিক মত বুঝতে না পারলে, অথবা কোনো সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে সমাধানের পথ না পেলে অতি আবেগপ্রবণতার দরুন সমস্যা থেকে নিজেকে বের করে আনতে না পারলে তাদের মস্তিষ্কের গতিময়তা কমে যায়। তারা আরো বেশি করে নিজেদের চিন্তার মধ্যে নিজেদের গুটিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। ফলে মস্তিষ্কের চালককেন্দ্র (motor centre) এবং সংবেদনকেন্দ্র (sensory area) ধীরে ধীরে কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে থাকে, শ্লথ হতে থাকে, অনড় হতে থাকে। এর ফলে ঐ ব্যক্তিরা প্রথমে বাইরের কর্মকাণ্ড থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে, তারপর নিজেদের পরিবারের আপনজন থেকে। একসময় নিজেদের সত্তা থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। তখন রোগীর চিন্তা (Thought), আবেগ (Affect), প্রত্যক্ষণ (Perception), ইচ্ছাশক্তি (Will), এবং আচার-আচরণে (Behaviour) ঐক্যহীন বা অসঙ্গতি ধরা পড়ে। রোগী স্নান, আহার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, শরীরের যত্ন নেয়া, লাজ-লজ্জার দিকে দৃষ্টি

দেয়া—ইত্যাদি ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন হয়ে যায়। স্কিটসোফ্রেনিয়া রোগীদের ইলিউশন, হ্যালুশিনেইশন, ডিলিউশন প্রায়ই ঘটে থাকে। তবে বেশি ঘটে থাকে ডিলিউশন এবং হ্যালুশিনেইশন (auditory hallucination)। যেসকল মুনি-ঋষি, মহাপুরুষ নামধারী স্কিটসোফ্রেনিয়া রোগী আছেন, তাঁরা ডিলিউশন অব ইনফ্লুয়েন্স এবং ডিলিউশন অব গ্র্যান্ডিয়ার-এ বেশি ভোগেন [৮]।

পাঠক, দীর্ঘ আলোচনার পর এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন—মহাপুরুষ, অবতার কখনোই শূণ্য থেকে সৃষ্টি হয় না। এঁদের গড়া হয়—শাসক-শোষক শ্রেণী, তল্পিবাহক বুদ্ধিজীবী, প্রচারমাধ্যম, ভণ্ড-বুজরুকের দল অবতার-মহাপুরুষদের কারিগর; আমরা সাধারণেরা তাঁদের প্ররোচনায় কী ভীষণ প্রতারিত হয়ে চলছি এতদিন! তাই তো ভারতের যুক্তিবাদী আন্দোলনের পুরোধা প্রবীর ঘোষ বলেন, "সকল মহাপুরুষ-অবতার এক একজন হয়তো মানসিক রোগী নয়তো ধান্ধাবাজ অভিনেতা।" এর থেকে বড় সত্য আর নেই।

তথ্যসূত্র :

(১) জন্মের পর থেকেই বুঝে না-বুঝে ঈশ্বরে-ধর্মে বিশ্বাসীরা রোজ কতবার যে হাতজোড় করে প্রার্থনা করে থাকেন, তার কোনো ইয়াত্তা নেই। সীমিতসাধ্যের সংকীর্ণতায় আকাশ-কুসুম সাধের বাহারি তালিকায় সাধারণ বিষয় থেকে কত যে অসাধারণ-অসম্ভব বিষয়াশয় এই প্রার্থনাতে উচ্চারিত হয়। অথচ এই বঙ্গাদেশেরই সন্তান, অনেকের কাছে অখ্যাত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক, বিজ্ঞানচিন্তক অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) একটি দার্শনিক ব্যাখ্যা দ্বারা অনেককাল আগেই প্রার্থনার ফলাফল শূণ্য বলে প্রমাণিত করেছেন, তা আমরা ক'জনে খবর রাখি! জানা যায়, একবার এই জ্ঞানতাপস ছাত্রদের দ্বারা 'প্রার্থনা করার প্রয়োজনীয়তা' নিয়ে জিজ্ঞাসিত হলে, উত্তর দেন—"কৃষিজীবী লোক পরিশ্রমের মাধ্যমে শষ্য লাভ করে; কিন্তু জগদীশ্বরের কাছে শুধুমাত্র প্রার্থনা দ্বারা কোন কৃষকের কস্মিনকালেও শষ্য লাভ হয় নাই।" পরবর্তীকালে তিনি একটি গাণিতিক সমীকরণ তৈরি করে, তাঁর দার্শনিক মন্তব্যের ভিত্তি জোরালো করেন। গাণিতিক সমীকরণটি হচ্ছে এরকম :—
পরিশ্রম = শষ্য
পরিশ্রম + প্রার্থনা = শষ্য
অতএব, প্রার্থনা = ০
অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মতভাবে বুঝা যায়, প্রার্থনা দ্বারা সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না।

(২) টীকা : ধর্মগুরুদের ভণ্ড-প্রতারক বলায় অনেক দুর্বলহৃদয়ের ঈশ্বরবিশ্বাসী মনে চোট পেতে পারেন। দুঃখিত, আপনাদেরকে কারণ ছাড়া ইচ্ছেকৃত চোট দেয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই; কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, এটাই বাস্তবতা। ধর্মের নাম, ঈশ্বরের নাম ইত্যাদি অলৌকিকতার নাম ভাঙিয়ে লোক ঠকানোর রীতি সারা পৃথিবীতেই রয়েছে, আর আমাদের ভারতীয় সভ্যতায় তো এই ইতিহাস অনেকে পুরনো। খ্রিস্টের জন্মের বেশ আগে, আজ থেকে প্রায় ২২০০ বছর আগে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের (৩২২- ২১৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) মন্ত্রী বিষ্ণুগুপ্ত বা কৌটিল্য (চাণক্য নামেও পরিচিত), তাঁর অর্থশাস্ত্রে এরকম বেশকিছু নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। এরকম একটি নির্দেশ—"কোন প্রসিদ্ধ পূণ্যস্থানে ভূমি ভেদপূর্বক দেবতা নির্গত হইয়াছেন এই ছলে সেখানে রাত্রিতে বা নির্জনে একটি দেবতার বেদী স্থাপন করিয়া ও এই উপলক্ষে উৎসবাদি ও মেলা বসাইয়া সেই স্থানে শ্রদ্ধালু লোকের প্রদত্ত ধন দেবতাধ্যক্ষ গোপনে রাজসমীপে অপর্ণ করিবেন। ...দেবতাধ্যক্ষ ইহাও প্রচার করিতে পারেন যে, উপবনে একটি বৃক্ষ অকালে পুস্প ও ফলযুক্ত হইয়াছে এবং ইহা হইতেই সেখানে দেবতার আগমন নিশ্চিত হইয়াছে। ...দেবতাধ্যক্ষ দুর্গের ও রাষ্ট্রের

দেবতাগণের ধন যথাযথভাবে একস্থানে একত্রিত রাখিবেন এবং সেইভাবে রাজাকে আনিয়া দিবেন।..." (উৎস: কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র, পঞ্চম অধিকরণ, দ্বিতীয় অধ্যায়, নব্বইতম প্রকরণ।) ছি! ছি! কী বিভৎস! মানুষ ঠকানোর কী জব্বর অপকৌশল! একটা শব্দ হয়তো অনেকের মনে খটকা লাগতে পারে—শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যাবতীয় দায়িত্ব যার ওপর সর্বোচ্চ অর্পিত থাকে তিনি অধ্যক্ষ হিসেবেই পরিচিত; আবার একইরকম সেনাদের দেখা ও পরিচালনার দায়িত্ব যাঁর ওপর থাকে তাকে বলা হয় সেনাধ্যক্ষ। তাহলে 'দেবতাধ্যক্ষ' আবার কী? এটা কী এরকম যে—মন্দির, পুরোহিত, পণ্ডিতদের দেখাশুনোর দায়িত্ব, মন্দিরে ভণ্ডামি করে অর্জিত অর্থ-সোনাদানা ইত্যাদি রাজার কাছে নিয়ে আসার দায়িত্ব সে সময় যার ওপর থাকতো তাকে বলা দেবতাধ্যক্ষ! এরকম হলে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। এবার গ্রন্থনির্দেশ পেরিয়ে বাস্তবেতিহাসে আসি:— ভারতের সোমনাথ মন্দিরের নাম হয়তো অনেকের জানা আছে। পূর্ব আফগানিস্তানের ছোট্টরাজ্য গজনির সুলতান আমুর মামুদ একাদশ শতাব্দীতে ভারত আক্রমণ করতে এসে পৃথিবীবিখ্যাত এই মন্দিরটি লুণ্ঠন করেছিলেন এবং সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। এ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই ভারতীয় হিন্দুদের অনেক হাঁ-হুতাশ! তবে আমাদের জন্য আসল কাহিনী অন্য জায়গায়। বিশাল এই মন্দিরটি বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে সেই সময়ই বিখ্যাত ছিল; এখানে ছিল প্রায় একহাজার ব্রাহ্মণ, শত শত নতর্কী ও গায়িকা এবং হাজার হাজার নর-নারীর বাসস্থান। চারিদিকে ছিল অতিসুন্দর কারুকার্য শোভিত নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল বিচিত্র বিবিধ রত্নখচিত ঝুলন্ত দীপাধার। সব থেকে আশ্চর্যজনক ছিল এই মন্দিরের শিবমূর্তি; বিগ্রহ কোন বেদীতে বসানো ছিল না—অবস্থান করত শূণ্যে, মন্দিরের ঠিক মধ্যখানে। তৎকালীন জনসাধারণের কাছে এ ছিল এক অত্যাশ্চর্যকর বিষয়, অনেকের কাছে অলৌকিক-অপার্থিব ব্যাপার-স্যাপার। তাই চাক্ষুস অপার্থিব ঘটনাকে দেখার জন্য এবং এ জীবনের সব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে অক্ষয় স্বর্গ লাভের জন্য প্রতিদিনই ধনী-দরিদ্র-যোদ্ধা-কামার-কুমার-বৈদ্য শত-শত ভক্ত এ মন্দিরে আসতেন এবং নিজেদের প্রচণ্ড পরিশ্রমে উপার্জিত অর্থ প্রণামী হিসেবে দেবতার পদতলে উজাড় করে ঢেলে দিত। দীর্ঘ বছর ধরে আস্তে আস্তে মন্দিরে জমে উঠেছিল বিশাল ঐশ্বর্য, যা তৎকালীন রাজার কাছে পাঠিয়েও শেষ হচ্ছিল না। সুলতান মামুদও এ মন্দিরের সৌন্দর্যে-রহস্যে অভিভূত হয়েছিলেন। তিনি মন্দিরের সমস্ত ধনরত্ন লুণ্ঠনের পর দেবতার শূণ্যে ঝুলে থাকার কারণ জানতে উৎসুক হলেন। সুলতান তাঁর সঙ্গে আসা বিজ্ঞানী-ধাতুবিদ-বাস্তুকারদের দিয়ে মূর্তিটি পরীক্ষা করিয়ে নিশ্চিত হলেন, এটি লোহার তৈরি এবং মন্দিরের চারপাশে চুম্বক পাথর বসানো আছে, যার ফলে লোহার মূর্তিটি মাঝামাঝি একটা জায়গায় এনে ছেড়ে দিলে বিভিন প্রান্তের আকর্ষণে এই মূর্তিটি ভেসে থাকছে। এখানে মূর্তি কোন বিষয় নয়, যে কোন লোহা এইরকম মধ্যখানে এনে ছেড়ে দিলে, সেটিও শুণ্যে ভেসে থাকবে। অবশেষে সুলতানের নির্দেশে মন্দিরের দেয়ালে লাগানো পাথরগুলো খুলে ফেলতেই বের হয়ে এল চুম্বকপাথর বা ম্যাগনেটাইট। একপাশের চুম্বক পাথর সরে যেতেই দেবমূর্তিটিও শূণ্য থেকে পড়ে গেল মাটিতে। অলৌকিকতার দাবিদার দেবমূর্তির রহস্য উদঘাটিত হল; কৌটিল্যের সাক্ষাৎ উত্তরপুরুষ মন্দিরের পুরোহিত-দেবতাধ্যক্ষদের কারসাজিতে দীর্ঘকাল ধরেই কী কৌশলে লোক ঠকিয়ে বিপুল পরিমাণ সম্পদ লুটে নেয়া হয়েছিল সেসময়; এটা কী প্রতারণা নয়? হয়তো আমাদের জন্মের অনেককাল আগের কথা বলে অনেকে দাবি করতে পারেন অতীতে কী ঘটেছে সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়, বর্তমানে কী ধর্মের নামে কেউ প্রতারণা করতেছেন? উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ অবশ্যই করতেছেন। চোখ-কান খোলা রাখুন, আপনারা নিজেরাই ভূরি-ভূরি প্রতারক-বুজরুক ধর্মগুরুদের চিনতে পারবেন। আর যারা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চান, কষ্ট করে প্রবীর ঘোষের দুই খণ্ডে রচিত *যুক্তিবাদীর চ্যালেঞ্জাররা* (দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা) গ্রন্থদ্বয় পাঠ করে নিবেন। গ্রন্থদ্বয়ে আপনারা পাবেন বর্তমানকালের বিভিন্ন দেশের অসাধারণ কৌশলী বুজরুক-ভণ্ড ধর্মগুরুদের যুক্তিবাদীদের কাছে বে-আব্রু হওয়ার কাহিনী ও সাথে টাটকা প্রমাণ। এখানে বাংলাদেশী পাঠকদের অগ্রিম জানিয়ে রাখছি (যারা গ্রন্থদুটি পড়েননি), উক্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (পৃষ্ঠা ১১৯-১৩২) আছে—প্রবীর ঘোষ এবং তাঁর যুক্তিবাদিদের সাথে বাংলাদেশের বিশেষভাবে (কু)খ্যাত ঢাকার কোটি-

কোটিপতি আধ্যাত্মিক ধর্মগুরু আলহাজ্ব হুজুর দেওয়ান মোহাম্মদ সাইদুর রহমান চিশ্‌তি সাইদাবাদির (সংক্ষেপে হুজুর সাইদাবাদী) রোমাঞ্চকর লড়াই। হুজুর কলকাতায় গিয়ে দাবি করলেন, তিনি যন্তর-মন্তর করে কাঁচাডিমকে টোকা দিয়ে সেদ্ধডিম বানিয়ে ফেলেন এবং সেই ডিমের কুসুম খাইয়ে দিয়ে সন্তান ধারণে অক্ষম নারীকে সন্তানসম্ভাবা বানিয়ে দিতে পারেন! কিন্তু প্রবীর ঘোষের পাল্লায় পড়ে কোথায় তাঁর কেরামতি দেখাবেন, তা না—উল্টো মান-সম্মান খুঁইয়ে হুজুর পালিয়ে ঢাকা চলে আসলেন। এই পালিয়ে আসার পরও হুজুরের হুঁশ হলো না, পরবর্তীতে আরো দুবার গোপনে ভারত সফর করলেন। এরপর ২১ ফেব্রুয়ারি (১৯৯৭)-তে কলকাতাতে আমাদের হুজুর বুজরুকি, প্রতারণা ও ড্রাগ এন্ড ম্যাজিক রেমেডিজ এক্ট ভঙ্গ করার দায়ে গ্রেপ্তার হন কিন্তু বাংলাদেশী রাষ্ট্রনায়কদের দেনদরবারে (হুজুরের খাসবান্দা হিসেবে আমাদের এরশাদ থেকে বেগম খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনার নাম পর্যন্ত আছে!) ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশী বুজরুক ধর্মগুরুকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন।

(৩) রাজেশ দত্ত, *মনোবিজ্ঞানের আলোকে ঈশ্বর দর্শন*, র‍্যাডিকেল ইম্প্রেশন, কলকাতা।

(৪) প্রবীর ঘোষ, *অলৌকিক নয় লৌকিক* (১ম, ২য়, ৪র্থ খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। ধীরেন্দ্রনাথ নন্দী, *মনের বিকার ও প্রতিকার*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা। অরুণকুমার রায়চৌধুরী, *অস্বাভাবিক মনস্তত্ব*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা।

(৫) টীকা : প্রাণীর সব রকমের ক্রিয়াকলাপই পরাবর্তক্রিয়া বা Reflex। এটি দুধরনের; শারীরক্রিয়া ও মননক্রিয়া। পরাবর্ত সম্পর্কে বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ইভান পেত্রভিচ পাভলভ (১৮৪৯-১৯৩৬) বলেন : "বহির্বাস্তবের ঘটনাবিশেষের সঙ্গে স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সংযোজন ব্যবস্থার ফলে গঠিত জীবদেহের নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়াকে পরাবর্ত বলে।" পাভলভ এখানে 'নির্দিষ্ট' শব্দটিতে বেশ জোর দিয়েছেন, কারণ তাঁর মতে—বহির্বাস্তবের বিশেষ উদ্দীপকটি যতবারই প্রয়োগ করা হোক না কেন, ততবারই একটি নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে; অন্য কোন উদ্দীপকে সেই নির্দিষ্ট সাড়া জাগবে না। এই প্রতিক্রিয়া বা সাড়া স্নায়ুতন্ত্রের এক নির্দিষ্ট সংযোজন (কার্য-কারণ) ব্যবস্থার ফল। আর 'শর্তাধীন পরাবর্ত' হচ্ছে—যে সকল ক্রিয়া অস্থায়ী, প্রাণীবিশেষের জীবদ্দশায় বাইরের পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার প্রচেষ্টায় আয়ত্ত অর্থাৎ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ ধরনের পরাবর্ত। একটা উদাহরণ দিই; কোনো ধরনের খাদ্যদ্রব্য মুখগহ্বরের সংস্পর্শে আনলে জিহ্বায় লালা নিঃসরিত হয়। শুকনো খাদ্যকে সিক্ত করা কিংবা কঠিন খাদ্যদ্রব্যকে লালায় সিক্ত করে নরম করা হয়, যাতে এই নরমখাদ্যদ্রব্য খাদ্যনালী দিয়ে সহজে পাকস্থলীতে গিয়ে পৌঁছতে পারে; এটা (লালা নিঃসরণ) প্রাণীর শারীরবৃত্তিমূলক ধর্ম বা শর্তহীন পরাবর্ত। আবার কোন খাদ্যের চেহারা-রঙ দেখার অথবা গন্ধ নাকে যাবার দরুন যে লালা নিঃসরণ হয়, তা শর্তাধীন পরাবর্ত। লালা নিঃসরণের মতো প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে মূলত রঙ, গন্ধ বা শব্দের কোন সম্পর্ক নেই। এই ধর্ম বা প্রতিক্রিয়া নিয়ে প্রাণী জন্মায় না, জীবদ্দশায় এটি অর্জিত হয়। শর্তাধীন পরাবর্তের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে পুরনো পরাবর্তের প্রয়োজন না থাকলে, আস্তে-আস্তে এটি ভেঙ্গে পড়ে; নতুন পরিবেশের সাথে অভিযোজনের মাধ্যমে নতুন শর্তাধীন পরাবর্ত গড়ে ওঠে। পরাবর্ত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আগ্রহীরা পড়তে পারেন—পাভলভ ইনস্টিটিউট, কলকাতা থেকে ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত *পাভলভ পরিচিতি*, পৃষ্ঠা : ৮- ২০।

(৬) টীকা : বিভিন্ন ধর্মের মহাপুরুষদের ধর্মপ্রচারের বেশ মজার-মজার কাহিনী প্রচলিত আছে। এরকম কাহিনীগুলোর মধ্যে সামান্য কটি উল্লেখ করছি—হিন্দুধর্মের মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ শিবলিঙ্গ মনে করে

নিজের পুরুষাঙ্গকে পুজো করতেন। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, উন্মাদ অবস্থায় লিঙ্গে মুক্তা পরিয়ে জীবন্ত লিঙ্গপুজা করতেন (উৎস: শ্রীম কথিত রামকৃষ্ণ কথামৃত, মূলপাঠ, চতুর্থভাগ, ১৫শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২১)! বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায়, তৈলঙ্গ স্বামী নিজের প্রস্রাব দিয়ে কালীর অর্চনা করতেন; প্রস্রাব করে কালীমূর্তির সারা শরীরে ছিটিয়ে দিতেন (উৎস: ভারতের সাধক, শঙ্করনাথ রায়, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০)! লোকনাথ ব্রহ্মচারী বলতেন, "আমার বিনাশ নাই, শ্রাদ্ধ নাই, আমি নিত্য পদার্থ। ...শতাধিক বৎসর পাহাড়পর্বত পরিভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নি। আমি দেখেছি আমাকে। (উৎস: অলৌকিক লীলাপ্রসঙ্গ, নন্দলাল ভট্টাচার্য, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৩)।"—হায়রে ধর্মাবতার! আপনাদের লীলা, বোঝা বড় ভার! ইহুদি, খ্রিস্টান এবং ইসলাম ধর্মের ধর্মগ্রন্থ থেকে জানা যায়, নবি ইব্রাহিম (কারো কারো কাছে আব্রাহাম) একদা স্বপ্নে আল্লাহর কাছ থেকে প্রিয় বস্তু বিসর্জনের নির্দেশ পেলেন। তিনি ধরে নিলেন, প্রিয় বস্তু হচ্ছে নিজের সন্তান। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলছি, কোরবানির জন্য নির্ধারিত সন্তান নিয়ে ইসলামধর্মের সাথে ইহুদি, খ্রিস্টান ধর্মের একটু বিরোধ আছে। তৌরাত শরিফের জেনেসিস অধ্যায়ের ২২:১-১৯ থেকে জানা যায় আল্লাহতায়ালা কোরবানির জন্য নবি ইব্রাহিমের কাছে হযরত ইসহাককে মনোনীত করেছেন; আর কোরানশরিফে সরাসরি বলা নেই, কোরবানির জন্য মনোনীত সন্তানটি কে? (সুরা সাফফাত, ৩৭:১০২-১০৭), তবে অন্যান্য সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ইসলামিচিন্তাবিদরা বলেছেন, আল্লাহর কাছে কোরবানির জন্য মনোনীত সন্তান হচ্ছে হযরত ইসমাইল। আগ্রহীরা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পাঠ করতে পারেন, বেনজীন খান সম্পাদিত *পশু কোরবানি: একটি বিকল্প প্রস্তাব*, সংস্কার আন্দোলন, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৫২-১৬৪। যা হোক, এ বিষয়টি নিয়ে আপাতত বিতর্ক না করে বলা যায়, নবি ইব্রাহিম আল্লাহর প্রেমে এতোই অন্ধ হয়েছিলেন যে, স্বপ্নের বিষয়কে সত্য মনে করে, নিজের সন্তানকে পর্যন্ত কোরবানি করতে নিয়ে গিয়েছিলেন! আবার, ইসলামধর্মের শ্রেষ্ঠ ঐশীগ্রন্থ কোরানশরিফ না-কী একসময় *লওহে মাহফুজে* সংরক্ষিত ছিল (৮৫:২২)। কিন্তু অবাক বিষয়, নবি হযরত মোহাম্মদের অনেক সামান্য ব্যক্তিগত ঘটনাও অপ্রাসঙ্গিকভাবে পবিত্র (?) কেতাবে ঠাঁই পেয়েছে; যেমন—চাচা আব্দুল উজ্জার সাথে ব্যক্তিগত রেষারেষি থেকে ঝগড়া হওয়ার কারণে একটি সুরা'ই (আল লাহাব, ১১১) নাজিল (?) হয়েছে, পোষ্যপুত্রের স্ত্রী জয়নবকে বিয়ে করার অনুমতিও আসে স্বয়ং আল্লাহতায়ালার কাছ থেকে (সুরা আহজাব, ৩৩:৪, ৩৭)! নবি মোহাম্মদের একাধিক স্ত্রীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব নিরসনে আল্লাহ বাণী পাঠিয়ে দেন জিবারাইল মারফত (সুরা তাহরিম, ৬৬:৩-৫), বিবি আয়েশাকে নিয়ে একটি গুজবে সৃষ্ট কেলেঙ্কারী দূর করতে (সুরা নুর, ২৪:৪-৫) এগিয়ে এল জিবরাইল, সঙ্গে আবারো আল্লাহর বাণী! এখন, যদি কেউ ধারণা করেন—তৎকালীন সময়ে নবি হযরত মোহাম্মদ অনাকাঙ্ক্ষিত নানা ঘটনা থেকে মুক্তির জন্য, অথবা বিভিন্ন ঘটনার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টির জন্য কৌশলে নিজের বক্তব্যকে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর বাণী বলে প্রচারিত করেছেন; তবে ঐ ব্যক্তির ধারণা যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে করেন কী?

(৭) টীকা : প্রতিটি ধর্মের মহাপুরুষ সম্পর্কে যতদূর জানা যায় তাঁরা সবাই নির্জনে বনে-জঙ্গলে কঠোর ইন্দ্রিয়সংযমের মাধ্যমে ধ্যানস্থ হতেন, নিজ-নিজ ঈশ্বরের উপাসনা করতেন। যেমন—রামকৃষ্ণ ছোটবেলায় গভীর জঙ্গলের কাছে শ্মশানঘাটে গিয়ে প্রায়ই একাকী কালীমায়ের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করতেন। পরবর্তীতে তিনি নিজেই অকপটে স্বীকার করেছেন—ভগবৎ-প্রেমের জন্য তাঁর এ বাহ্যজ্ঞানহীনতা নয়, বরং মন্দিরে সাধকদের নানা নিয়ম, কঠোর ব্রতাদি পালন ইত্যাদি করতে করতে মাথায় গণ্ডগোল দেখা দেয়, মনোবৈকল্যের সৃষ্টি হয়েছে (উৎস: শিবনাথ শাস্ত্রী, *মহানপুরুষদের সান্নিধ্যে*, পৃষ্ঠা ১৫১-১৫২)। ইসলামের ইতিহাস থেকে জানা যায়, নবি হযরত মোহাম্মদ তৎকালীন সময়ে লোকালয় থেকে অনেক দূরে হেরা পর্বতের গুহায় সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় আল্লাহর উপাসনা করতেন। বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে জনমানবশূণ্য পরিবেশে এরকম কঠোর ইন্দ্রিয়সংযমের মাধ্যমে দীর্ঘদিন অবস্থান করলে মস্তিষ্কের

কার্যকলাপে বিকৃতি ঘটা স্বাভাবিক ব্যাপার।—এ আমার নিজস্ব কোন বক্তব্য নয়, মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষালব্ধ ঘোষণা। এখানে কানাডার প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ড. হেবের একটি গবেষণার কথা উল্লেখ করতে পারি। ড. হেব কয়েকজন সুস্থ যুবককে একটি ছোট ঘরের মধ্যে মাত্র ছত্রিশ ঘন্টা থেকে দশদিন পর্যন্ত ইন্দ্রিয়বোধ থেকে বঞ্চিত করে রাখার ব্যবস্থা করেন। পরীক্ষার জন্য ঘরটা অন্ধকার ও শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ছিল। ঘরের দেয়ালগুলো ছিলো নিরেট, শব্দরোধী—যাতে বাইরের কোনো আওয়াজ ভেতরে আসতে না পারে এবং ভেতরের আওয়াজ বাইরে না যেতে পারে। হাতে দস্তানা পরিয়ে ও কার্ডবোর্ডের টিউব লাগিয়ে স্পর্শানুভূতিকে অকেজো করা হয়েছিল। ছত্রিশ ঘন্টা পের না হতেই ঐ যুবকদের নানা রকম মানসিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়; নিঃশব্দতা, অন্ধকার, নিঃসঙ্গতা, ইন্দ্রিয়ের নিষ্ক্রিয়তা মস্তিষ্কের কোষগুলো সহ্য করতে পারল না। মস্তিষ্কের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে সকলের মধ্যেই ক্রমান্বয়ে 'হ্যালুসিনেইশন' ও 'ডিলিউশন' দেখা দেয়। আধুনিককালে মহাকাশ শারীরবৃত্তের গবেষণা থেকেও জানা গেছে, ইন্দ্রিয়জ সংবেদরহিত হলে মস্তিষ্কে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়; মস্তিষ্কের সুস্থ ও স্বাভাবিক কাজকর্মের জন্য ইন্দ্রিয়গুলোর সজাগ ও সক্রিয় থাকা খুব জরুরী (উৎস: রাজেশ দত্ত, *মনোবিজ্ঞানের আলোকে ঈশ্বর দর্শন*, র‍্যাডিকেল ইম্প্রেশন, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৭৩-৭৪)।

(৮) উপরের তিনটি মানসিকঅসুখ ও নানা কেসস্টাডি নিয়ে বেশ প্রাণবন্ত আলোচনা রয়েছে প্রবীর ঘোষের *অলৌকিক নয় লৌকিক* সিরিজ গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে।

চলবে...